সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণ
ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ
ইতিহাস মেজর, ষষ্ঠ সেমিস্টারের স্টাডি মেটেরিয়াল

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার গ্রামীণ ও মরমি চেতনার সঙ্গে মিশে থাকা এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের নাম ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের শুরুর লগ্নে, যখন বাংলার মাটি ছিল সদ্য উপনিবেশিক করালগ্রাসে আক্রান্ত, তখনই এই প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এটা নিছক কোনো বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ছিল না; বরং বাংলার গহীন অরণ্য, পর্বতপাদ ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা এক দীর্ঘস্থায়ী, ঐতিহ্যনির্ভর, আত্মিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি তখনও তাজা, যার ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ জমা হচ্ছিল দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা অন্তর্লোকে। এই ক্ষোভের আগুনেই শিখা ধরান মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী কিংবা নূরুল উদ্দীনের মতো প্রতিরোধের নায়করা।

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনকে কেউ কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় প্রতিরোধ হিসেবে দেখেন। আবার কেউ এটিকে কিছু দস্যুর উন্মত্ততা বলে খারিজ করেন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা অনেক জটিল ও বহুস্তরীয়। এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সুফি তরিকার অনুসারী মুসলিম ফকির এবং বেদান্তাচারী হিন্দু সন্ন্যাসীরা, যাঁদের অনেকেই তীর্থযাত্রার পথে বা আখড়ায় আশ্রিত হয়ে ধর্মীয় দান গ্রহণ করতেন, আর একথাই কোম্পানির চোখে পরিণত হয়েছিল অননুমোদিত অর্থ আদায়ে। এখান থেকেই শুরু হয় সংঘাত। ইংরেজ শাসনযন্ত্র যখন কর আদায়ে অতিমাত্রিক চাপ সৃষ্টি করে, এবং সমাজের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক কাঠামোয় অনধিকার হস্তক্ষেপ করে, তখন এই প্রাচীন তপস্বীগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হন।

১৭৬০ সাল থেকে এই প্রতিরোধ শুরু হলেও তা প্রকৃত রূপ পায় ১৭৬৩ সালের পর। বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বাকেরগঞ্জ, কুচবিহার, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে বিদ্রোহীরা হানা দিতে শুরু করেন ইংরেজদের কুঠি ও অনুগত জমিদারদের দপ্তরে। গেরিলা কৌশলে পরিচালিত এসব হামলা এতটাই সুসংগঠিত ছিল যে কোম্পানির সেনাপতিদের রীতিমতো উদ্বিগ্ন হতে হয়। তাঁদের বাহিনী কখনো কখনো পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার ফকির-সন্ন্যাসী নিয়ে গঠিত হত, যারা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের শক্তি হয়ে উঠেছিল। মজনু শাহ ও তাঁর শিষ্যদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন হয়ে ওঠে এক অভূতপূর্ব মিলিত ধর্মীয় প্রতিরোধ, যেখানে সুফি খানকাহ ও সন্ন্যাসী আখড়ার মধ্যে এক আশ্চর্য ঐক্যের সূচনা ঘটে।

এই আন্দোলনের আরেক অনন্য দিক ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কোম্পানির কঠোর ভূমি রাজস্ব নীতিতে পর্যুদস্ত কৃষকরা যখন জমি ফেলে রেখে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ভিক্ষাজীবী এই সম্প্রদায় একরকম রণসন্ন্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পরিণত হয় জনযোদ্ধায়। এতে যেমন ধর্মীয় আবেগ কাজ করেছে, তেমনই ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিশোধের মনোভাব। ভবানী পাঠক কিংবা দেবী চৌধুরানীর মতো নেতারা রীতিমতো সামরিক গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে বাহিনী গড়ে তোলেন, গড়ে তোলেন দুর্গ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সমন্বিত সামরিক কৌশল।

প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় বহু যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৭৬৩ সালে বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, রাজশাহী—একটির পর একটি কুঠি আক্রান্ত হয়। ১৭৬৭ সালে রংপুরে প্রেরিত হয় ইংরেজ সেনাবাহিনী, কিন্তু তাতে কোনো নিরুত্তাপ সমাধান মেলে না। বারবার সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে কোম্পানি বাহিনী পরাজয়ের মুখ দেখে। ১৭৭১ সালে ফেলথামের বাহিনীর হাতে শতাধিক ফকির নিহত হয়, আবার এরই পরের বছর মজনু শাহ নিজে রাজস্ব অফিস দখল করে নেন এবং সেই সম্পদ কৃষকদের মধ্যে বিলি করেন। তাঁর মধ্যে ছিল করুণাময় নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ প্রতিরোধশক্তির অপার বিকাশ। ১৮০০ সালের আশেপাশে এসে এই আন্দোলনের মূল স্রোত স্তিমিত হয়ে আসে, কিন্তু তা শেষ হয়ে যায়নি। মজনু শাহের মৃত্যুর পর মুশা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, জরিশাহর মতো নেতারা নেতৃত্বে আসেন। কখনও তাঁরা গোপন বৈঠকে মিলিত হন ভবানী পাঠকের সঙ্গে, আবার কখনও দেবী চৌধুরানীর সহযোগিতায় যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। ইতিহাসে এই সময়টিকে বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়, যখন নেতৃত্ব ছিল decentralised, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল এক—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই।

মুশা শাহ ছিলেন মজনু শাহের প্রকৃত উত্তরসূরি। ১৭৮৭ সালে তিনি রাজশাহী আক্রমণ করেন, প্রতিহত করেন স্থানীয় জমিদারদের। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল গেরিলা কৌশলের নিখুঁত প্রয়োগ, যা ইংরেজ সেনাদের রীতিমতো নাজেহাল করে তোলে। অন্যদিকে সোভান আলি বিহার, বাংলা ও নেপালের সীমান্ত অঞ্চলে একপ্রকার বিদ্রোহের বলয় গড়ে তোলেন, যা এতটাই ভয়ানক রূপ নেয় যে ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ঘোষণা

করে। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও এটিকে শুধু ধর্মীয় বিদ্রোহ বলে ক্ষীণ করে দেখা যাবে না। এটি ছিল একাধারে জাতীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বোধের সমন্বিত প্রতিরোধ। মরমি দর্শনের সঙ্গে সামরিক কৌশলের সম্মিলনই এই বিদ্রোহকে আলাদা করে তোলে। এর সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থ, তৃণমূলের কষ্ট, জমিদারদের শোষণ এবং ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতা—সব মিলে এক জ্বলন্ত বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছিল। দেবী চৌধুরানী ছিলেন এই বিদ্রোহের নারী আইকন। ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তিনি নিজেই গড়ে তোলেন প্রতিরোধ বাহিনী। তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ ছিল এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়, যার শেষ হয় ১৭৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে। কিন্তু ইতিহাসে তিনি চিরস্থায়ী হয়ে থাকেন ‘চণ্ডী মা’র সম্মানে। তাঁর মতো আরও অনেক নারী—পাঙ্গার রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া, গুপ্তচর পবিত্রা বা কাকিনার অলকা—এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, যারা নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চে নামেন।

এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখে বোঝা যায়, এটি নিছক একটি ধর্মীয় দল বা সামাজিক শ্রেণির বিদ্রোহ ছিল না। বরং এটি ছিল বাংলার বহুত্ববাদী ও প্রতিরোধী ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। যদিও আধুনিক ইতিহাসের মূল ধারায় একে অনেক সময় অবহেলিত রাখা হয়, তবু বাংলার জনমন ও আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে এই বিদ্রোহ গভীরভাবে যুক্ত। বিদ্রোহীদের পরাজয় যেমন চূড়ান্ত হয়নি, তেমনি তাঁদের কণ্ঠও থেমে যায়নি। পল্লিগাথা, কাহিনি, লোকপ্রবাদের মধ্যে আজও মজনু শাহ, ভবানী পাঠক কিংবা দেবী চৌধুরানীর নাম জেগে আছে।

সুতরাং, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেন শুধুই একটি সামরিক অধ্যায় নয়—এটি ছিল বাংলার আত্মার প্রতিরোধ, যেখানে মাটি, মানুষ, আধ্যাত্মিকতা ও অধিকার মিলেমিশে এক অনন্য ঐতিহাসিক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। একথা ঠিক যে, ইতিহাস হয়ত তাদের সবসময় জায়গা দেয়নি, কিন্তু ইতিহাসের ভিত গড়ার কৌশলে তাদের চিহ্ন অমোচনীয়।